**International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)**
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 97-107
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
**DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.273**

# যাত্রাপথ ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য

**অনন্যা নস্কর**

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

*Migration for survival plays a significant role in human adaptation. In literature, we find the context of voyage, travel or expedition etc. In folklore, the journey motif is well known all over the world.*

*In Mangalkabya, voyage is one of the key elements. Chand Saudagar, Dhanapati, Shrimanta, Lausena - all these characters of Mangalkabya are mentioned as travelling by sea. In a journey one moves from one place to another, but also gains experience, which transforms the character. Kabikankan Mukunda described three journeys in his 'Chandi Mangalkabya'. Dhanapati went to Gour in search of a gold cage for the king. Then he went to Dakshin Patan and never came back home. Shrimanta went to Dakshin Patan in search of his lost father Dhanapati. Apart from this, Kabikankan himself left his ancestral house 'Daminya' in search of safe land.*

*All these journeys tell us about the social structures, trade, ritual, craftsmanship of medieval Bengal. Devi Chandi's charismatic power is described through these journeys and its consequences.*

**Keywords:** Mangalkabya, Chandimangalkabya, Journey, Archetype, Voyage, Kavikankana Mukunda.

জীবনধারণের তাগিদে মানুষ নিজেকে বারবার মানিয়ে নিয়েছে পরিবেশের সাথে। 'চরৈবেতি' মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। টিকে থাকার লড়াই ও অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছিল এক স্থান পরিত্যাগ ক'রে অন্য স্থানে যাত্রা। 'যাত্রা' শব্দটির বুৎপত্তি হ'ল '[স. √যা+ত্র+আ (টাপ্)] বি.' এবং অর্থ হ'ল 'গমন', 'প্রস্থান', 'নির্বাহ', 'যাপন' ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম অঙ্গ হ'ল সমুদ্র অভিযান। মঙ্গলকাব্যে ধনপতি, শ্রীমন্ত, লাউসেন, চাঁদ এদের সকলেরই সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা রয়েছে। 'ওডিসি' মহাকাব্যে ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ওডিসিয়াসের নিজের রাজ্যে ফিরে আসার দীর্ঘ যাত্রাপথের কাহিনী আমরা পাই। রামায়ণ ও মহাভারতেও বারবার নানান পরিভ্রমণের কথা এসেছে। মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, - 'সমুদ্রপথের বর্ণনা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ।'[i] যাত্রাপথের মধ্যে শুধু সমুদ্রযাত্রা পড়ে এমনটা নয়, তবে বাংলা মঙ্গলকাব্যে মূলত জলযাত্রারই প্রাধান্য দেখা যায়। যাত্রাপথ লোককথার জগতেও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, রূপকথায়, সিন্দাবাদের নাবিকের গল্প ইত্যাদি নানা কাহিনীতে যাত্রাপথের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত। লোকসাহিত্যে সারা বিশ্বজুড়ে 'journey'একটি গুরুত্বপূর্ণ 'আর্কিটাইপ' "it is a journey to find a truer self-hood ; one that cannot be easily corrupted by the outer world, or by time,"[ii]. সাধারণত দেখা যায় রূপকথায় একজন নায়ক কোন কঠোর কাজ সম্পন্ন করার জন্য অজানা পথে এগিয়ে যায়। সেই যাত্রাপথের মধ্য

দিয়ে নতুন জীবনবোধ গড়ে ওঠে। শারীরিকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বিষয়টির সাথে জুড়ে যায় মানসিকভাবে ও জীবন-দর্শনগতভাবে এক অবস্থান থেকে ভিন্নতর অবস্থানে উপনীত হওয়ার বিষয়টিও।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রধাণত তিনটি যাত্রার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম যাত্রায় ধনপতি সোনার পিঞ্জর আনতে গৌড়নগর গেছে। দ্বিতীয় যাত্রায় ধনপতি দক্ষিণ পাটন গেছে কিন্তু সেখান থেকে উজানি নগরে আর ফিরে আসেনি। তৃতীয় যাত্রায় ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত বারো বছর পরে আবার সিংহল যাত্রা করেছে পিতার সন্ধানে।

মঙ্গলকাব্যের যাত্রাপথ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে- এই যাত্রাগুলি কাব্যের অংশ বিশেষ, বাস্তব সত্যের বিষয় এগুলো নয়। আর একটি যাত্রার বর্ণনা আছে যাতে বাস্তবের মাটির স্পর্শ আছে। এই চতুর্থ পথের আখ্যান হ'ল কবির নিজের জীবনের বাস্তব ঘটনা। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ব্যাধখণ্ডের 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে কবিকঙ্কণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন, সেখানেও আছে এক দুর্ভাগ্যজনক বাস্তুভিটা ত্যাগের ঘটনা।

কবি নিজের সাত পুরুষের ভিটা দামিন্যা ছেড়ে আড়রা আসার বর্ণনা করেছেন 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে। রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে কবি বাধ্য হয়েছেন তাঁর পূর্বপুরুষের বাস্তু, জমি, মায় চিরপরিচিত সবকিছু ত্যাগ ক'রে, সপরিবারে স্ত্রী-পুত্রের সাথে অনিশ্চিত পথে পা বাড়াতে। এই পথে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে।

"ভেলিঞাতে উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।"[iii]

ভেঠনায় রূপ রায় তাঁর টাকা-পয়সা চুরি-ডাকাতি ক'রে নিয়েছে। অপর দিকে যদু কুণ্ডুর কাছ থেকে তিনি সাহায্যও পেয়েছেন।

অ্যান্টি আর্নে এবং স্টিথ থমসনের লোককথার 'টাইপ' পদ্ধতির মধ্যে আমরা পাই 'অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারিণী'র (৫০০-৫৫৯) প্রসঙ্গ। বিত্তহীন অসহায় কবিকঙ্কণকে যদু কুণ্ডু তিলি যাত্রাপথের জন্য তিন দিনের ভিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই বিপদগ্রস্ত অসহায় অবস্থায় তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ও দিয়েছেন। ক্ষুধা নিবারণের সাথে সাথে নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তির বিষয়টিও 'যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা' এর মধ্যে দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। মুড়াই বা মুণ্ডেশ্বরী নদী পার হয়ে কবি সপরিবারে তেউট্যা গ্রামে উপনীত হন। সেখান থেকে দারুকেশ্বর যান। এরপর এক দিনের পথ পেরিয়ে তাঁরা কুচট্যা গ্রামে উপস্থিত হন। অস্থির বিপদগ্রস্ত অবস্থায় কুচট্যা গ্রামে দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পান কবি। যখন অসহায় কবি 'ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে' ক্লান্ত, তখন দেবী চণ্ডী 'উরিয়া মায়ের বেশে' স্বপ্নাদেশ দেন চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করার জন্য।

"উরিয়া মায়ের বেশে আসিয়া শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।"[iv]

নিরাপত্তাহীনতায় অস্থির কবির কাছে দেবী বরাভয় মাতৃরূপে উপস্থিত হয়েছেন। পরবর্তী সময় কবি মুকুন্দ তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'অভয়ামঙ্গল'। মূল কাব্যের কাহিনীতে দেখা যায়, অসহায় অবস্থা থেকে দেবী তাঁর ভক্ত কালকেতু, ফুল্লরা, খুল্লনা ও শ্রীমন্ত এদেরকে রক্ষা করেছেন বারবার। 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে দেখা যায় কবি চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনার বহু পূর্বেই নিজের জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দেবী চণ্ডীর সহায় লাভ করেছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনার বীজ এই যাত্রাপথের সঙ্কট ও সঙ্কট মুহূর্তে স্বপ্নাদেশের মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে। এই পথ-বৃত্তান্তটি কবির জীবনে যেমন নতুন দিক নির্দেশ করেছিল তেমনি চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পথের অভিজ্ঞতা মানুষকে নতুন উপলব্ধিতে

উপনীত করে। স্বল্পপরিসর ও সীমাবদ্ধতার বিপরীতে পথ চলিষ্ণুতা ও প্রবহমানতার প্রতীক। ঘরের নিয়ম বন্ধন থেকে পথ মুক্ত। দামিন্যায় মুকুন্দ ছিলেন এক সাধারণ কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ, তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'দামিন্যায় চাষ চাষী'। দামিন্যা থেকে আড়রা যাবার সময়, পথের যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন তা কবিকে নিজেরই নতুন সত্তার সন্ধান দেয়। পথের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা, অসহায়তা ও মানসিক কষ্টের মাঝে থেকেই উৎসারিত হয় 'কবিকঙ্কণ' হয়ে ওঠার প্রথম রশ্মি।

যাত্রা শেষে তিনি বাঁকুড়া রায়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেন এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দামিন্যা ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু সমষ্টিগত অবচেতনার প্রভাব আছে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে। 'A more or less superficial layer of the unconscious is undoubtedly personal ... identical in all man and thus constitutes a common psychic substrate of a suparpersonal nature which is present in everyone of us.'[v] এর ফলে লোকসাহিত্যের টাইপ, মোটিফ, আর্কিটাইপ ইত্যাদি তত্ত্বের দিক থেকেও কবি মুকুন্দের যাত্রাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। টাইপ পদ্ধতিতে 'অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য অসাধ্যসাধন' (460-499) এর অন্তর্গত হয়ে পড়ে কবিকঙ্কণের যাত্রা। তাঁর যাত্রা একাধারে 'ভাগ্যের খোঁজে যাত্রা' (460 B)। আবার সেই ভাগ্যের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁকে পাড়ি দিতে হয় অজানা বিপদ সংকুল পথে। তাই কবির এই যাত্রাকে 'অজানা পথে যাত্রা'র (465 A) মধ্যেও অন্তর্গত করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বণিক খণ্ডের মধ্যে আমরা তিনটি যাত্রার বিবরণ পাই। বণিকের কাজই হল এক স্থান থেকে অন্যত্র পণ্যবস্তুর আমদানি- রপ্তানি করা। তাই বণিক ধনপতিকে একাধিক বার রাজার নির্দেশে দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য যেতে হয়েছে। ধনপতি ধনী বণিক বংশের সন্তান, ফলে পিতৃপুরুষের গচ্ছিত সম্পদের দৌলতে সে বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দ্বিতীয় স্ত্রী লহনাকে বিবাহ ক'রে সেই সংবাদ রাজা বিক্রমকেশরীর কাছে জানাতে গেলে রাজা তাকে শুক পাখির জন্য সোনার পিঞ্জর আনতে গৌড়ে যেতে আদেশ দেয়।

ধনপতি অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজার নির্দেশ পালনের জন্য গৌড় যেতে বাধ্য হয়। বিবাহের সংবাদ দিতে গিয়ে রাজার আদেশ হঠাৎ নেমে এসেছে। এমনকি বাড়ি গিয়ে গৌড় যাওয়ার সংবাদ দিতেও নিষেধাজ্ঞা ছিল।

"ঘরে জাইতে নৃপতির নাহিক আদেশ।
দূতমুখে লহনারে কহিল বিশেষ।।"[vi]

এই ঘটনা তৎকালীন সমাজে ক্ষমতার বিন্যাসটিকে চিহ্নিত ক'রে দেয়। যদিও বণিকরা সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিল তবু রাজার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ছিল বেশি।

ধনপতির গৌড় যাত্রা ছিল স্থলপথে যাত্রা। তবে নদীমাতৃক দেশে পথের মাঝে নদী পার হওয়ার প্রসঙ্গটিও এসেছে।

"রাত্রি দিন চলে সাধু না করে রন্ধন।
খিরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ।।
সিতলপুরেতে গেল চতুর্থ দিবসে।
বড় গঙ্গা পার হয়্যা গৌড় প্রবেশে।।"[vii]

ধনপতি "বড় গঙ্গা পার"[viii] হয়ে গৌড় প্রবেশ করে। তৎকালীন সময় গঙ্গাকে দুই নামে ডাকা হত- বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা। এখন যাকে হুগলী নদী বলা হয় তাকে বলা হত ছোট গঙ্গা, "নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দক্ষিণবাহিনী নদী আমরা যাহাকে বলি ভাগীরথী (বর্তমানে হুগলীনদী) তাহার কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু এই গঙ্গা ছোট গঙ্গা।"[ix], আর পদ্মাকে বলা হত বড় গঙ্গা, "পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী, উহাই বড়গঙ্গা।[x]

পিঞ্জর নির্মাণের জন্য প্রায় ছয় মাস ধনপতি গৌড়ে থাকে। দেবী চণ্ডী লহনার বেশে ও পদ্মাবতী খুল্লনার বেশে স্বপ্নে বলে "বিলম্ব দেখিআ তোর/ নৃপতি মানিল চোর/ লুটিআ লইল সব কোষ।।" এই স্বপ্ন দেখে ধনপতি আর বিলম্ব না ক'রে উজানিতে ফিরেছে। ফেরার সময়ও সে স্থলপথে ফিরেছে। উপরন্তু কবি উল্লেখ করেছেন হাতির পিঠে চেপে ফেরার কথা।

"গজ-পিঠে সদাগর জায় ত্বরা ত্বরা।
নাহী মানে সদাগর বসন্তের খরা।।
...
ছয় দিবসের পথ আইল দুই দিনে।।"[xi]

জলপথে যাত্রা ছিল সবচেয়ে আরামদায়ক এবং নিরাপদ। তবে স্থলপথও গ্রাম ও নগরগুলিকে যুক্ত করতো। স্থলপথে পায়ে হেঁটে যাতায়াত বহুল প্রচলিত ছিল। এছাড়া বিবাহের সময় ডুলি, পালকি ব্যবহৃত হত। ধনী ব্যক্তিরা যাতায়াতের সময় ডুলি,পালকি, অশ্ব, হাতি,গরুর গাড়ি ব্যবহার করতো। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থের আদিপর্বে বলেছেন, "রাজ-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তরা, বড় বড় ভূম্যধিকারীরা হাতিতে চড়িয়াও যাতায়াত করিতেন,"[xii]। ধনপতি গৌড় থেকে ফিরে রাজার সাথে প্রথমে দেখা করে। রাজ দরবার থেকে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় বাজনা বাজিয়ে কোলাহল ক'রে ফিরেছে-

"চড়িআ পাটের দোলা চলে নিজ ধাম।।
সিঙ্গা কড়া টমক বাজনে উতরোল।"[xiii]

ধনপতির গৌড় যাত্রার ফলে তার পরিবারের অভ্যন্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রথম পত্নী লহনার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, ফলে সপত্নী বিদ্বেষে সে খুল্লনাকে ছাগল চরাতে বাধ্য করে। খুল্লনার জীবনে ধনপতির এই যাত্রা অভিশাপ বহন করে আনে। খুল্লনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন দেবী চণ্ডী। স্বামী ফিরে আসায় খুল্লনার ওপর লহনার অত্যাচার বন্ধ হয় কিন্তু সমাজের কঠোর শাসন দেখতে পাই যখন পিতৃশ্রাদ্ধে ধনপতির বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজের ব্যবস্থায় খুল্লনার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে :

"বনে ছাগল লৈয়া জার ভ্রমিল যুবতি।।
কোক ভাল্লুক সনে শতেক মাতাল।
সেই বনে তার জায়া ছাগল-রাখাল।।"[xiv]

বিধান হয় যে খুল্লনাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে, তা না হলে এক লক্ষ 'তঙ্কা' দিতে হবে। বস্তুত ধনপতির গৌড় যাত্রার দুর্ভোগের অধিক ফল ভোগ করতে হয়েছে খুল্লনাকে। পরবর্তী সময় রাজা আবার যখন ধনপতিকে দক্ষিণ পাটন যেতে বলে তখন সে বলে "দক্ষিণ পাটনে পাঠাও অন্য জনে।।"[xv]

ধনপতিকে রাজা আদেশ দেয় চন্দন, লবঙ্গ,গুয়া, সৈন্ধব, শঙ্খ, নীলা, চুয়া, কুমকুম, চামর, কস্তুরি, দ্রাক্ষা ইত্যাদি সিংহল থেকে আনার জন্য। সন্তান সম্ভবা খুল্লনা ধনপতির দক্ষিণ পাটন যাত্রার সংবাদ শুনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ধনপতির অনুপস্থিতির সময়ে খুল্লনাকে বিপদ মুক্ত করার জন্য "সন্দেহ ভঞ্জন-পত্র করিল লিখিতী"[xvi]। 'জায়পত্র'তে ধনপতি বলে যায় কন্যা হলে শশীকলা নাম দিতে, পুত্র হলে শ্রীমন্ত নাম দিতে। এই পত্রের মধ্যেই পরবর্তীকালে শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাটন যাত্রার বীজ নিহিত ছিল। ধনপতি এই পত্রেই বলে ছিল -

"এগার বৎসরে জদি নহে আগমন।
আমার উদ্দির্শ জাবে দক্ষিণ পাটন।।"[xvii]

সিংহল থেকে ফিরে না আসার আশঙ্কা প্রথম থেকেই ছিল।"নৌকায় আরোহণ ও দূরদেশে জলযাত্রার ক্ষেত্রে পাঁজিপুথির কাল-দোষ খুব মেনে চলা হত।"[xviii] দৈবজ্ঞ খড়িবজ্র খাঁ গণনা ক'রে বলে, এই যাত্রা শুভ হবে না।

তৎকালীন সময়ের লোক-বিশ্বাস এই জ্যোতিষ গণনার মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে। শুভ তিথিতে যাত্রার সংস্কার সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রচলিত। যাত্রাপথের অনিশ্চয়তার জন্য যাত্রাপথ বিষয়ক নানা বিধি-নিষেধ, সংস্কার সমাজে প্রচলিত। যাত্রা আরম্ভে হোঁচট খেলে, টিকটিকি ডাকলে, হাঁচি হলে যাত্রা শুভ হয় না বলে লোক-বিশ্বাস আছে। এছাড়া বিড়াল রাস্তা পার হলে, দক্ষিণে শিয়াল দেখলেও অশুভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল,ধর্মমঙ্গল এবং মধ্যযুগের বহু রচনায় এই সংস্কারের কথা জানা যায়। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন - 'যাত্রাকালে শুভাশুভ বিষয়ক পদ বহু প্রাচীন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কাশীরাম দাশের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে এই বিষয়ক পদ পাওয়া যায়।"[xix] যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা বলেছে -

"কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র ঊঝঁট না মানিলোঁ।।
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।।...
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।।
কান্ধে কুরুআঁ লআঁ তেলী আগে জাএ।
শুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।।"[xx]

যাত্রাপথের নিষেধ ও শুভ-অশুভ সংস্কারের বিষয়টি বাংলার প্রবাদ-প্রবচনেও দেখা যায়-

"হাঁচি জিঠি যে জন বাছে, বিঘ্নের সময় সে জন বাঁচে।"[xxi]

আবার মনে করা হয় বুধবার দিনটি যাত্রার জন্য শুভ -

"মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।।"[xxii]

ধনপতির আসন্ন ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা ব'লে দৈবজ্ঞ অশুভ সংকেত দিয়ে যায়।

দক্ষিণ পাটন যাত্রার প্রসঙ্গে আমরা সে সময়ে জলপথে অধিক দূরত্বের পথে পাড়ি দেবার জন্যে বিভিন্ন জলযান, প্রস্তুতি, বাণিজ্য সম্ভার ও সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারি। ভ্রমরার জলে ডুবে থাকা নৌকাগুলি তোলা হয়। সওদাগরের নৌকা গুলি হল পূর্বপুরুষের তৈরি। নৌকাগুলির নাম হল- 'মধুকর', 'দুর্গাবর', 'গুয়ারেখি', 'শঙ্খচুড়', 'মধুপাল', 'ছোটমুঠি' ইত্যাদি।

তৎকালীন সময়ে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল জলযান। আয়তন ও ব্যবহার অনুযায়ী 'যুক্তিকল্পতরু' জলযানকে দুই ভাগে ভাগ করেছে- 'সামান্য' ও 'বিশেষ'। ছোট নদীতে চলাচল করে 'সামান্য'- এই নৌকা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুসারে দশটি ভাগে বিভক্ত - ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, চপলা, ভীমা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা, মন্থরা। 'বিশেষ' নৌকা গভীর সমুদ্রে চলাচল করতো, এর দুটি ভাগ "দীর্ঘা" ও "উন্নতা"। 'দীর্ঘা'র আবার দশটি ভাগ ছিল - দীর্ঘিকা, তরণী, লোলা, গত্বরা, গামিনী, তরী, জঙ্ঘলা, প্লাবিনী, ধরণী ও বেগিনী। 'উন্নত' শ্রেণির নৌকা ছিল পাঁচটি - ঊর্ধা, অনূর্ধা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিণী, মন্থরা। দূর সমুদ্রযাত্রায় "উন্নতা" নৌকা ব্যবহৃত হত। ধনপতির নৌকাগুলিও ছিল এক-একটি এক-এক রকম বিশেষত্ব বিশিষ্ট। মধুকরে আছে সুবর্ণ রইঘর।

"প্রথমে তুলিলা ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুদুই সুবর্ণে জাহার রইঘর।।"[xxiii]

'দুর্গাবর' নৌকায় অনেক মাঝি থাকতে পারে-

"আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে দুর্গাবর।

অখণ্ড চাপিআ তার বসিব গাবর।।"[xxiv]

'শঙ্খচুড়' আশি গজ জল ভেঙে চলে-

"আর ডিঙ্গা তুলিল নামেতে শঙ্খচুড়
আসী গজ পানি ভাঙ্গিয়া লয় কুল।"[xxv]

'ছোটমুঠি' শস্য বহন করে, সেখানে বাহান্ন পউটি চাল যাবে -

"আর ডিঙ্গা তুলিল নাম ছোটমুঠি।
সেই নায়ে ভরা চালু বায়ন্ন পউটি।।[xxvi]

প্রতিটি নৌকা দূর সমুদ্রে যাত্রার জন্য উপযুক্ত।

ধনপতি বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ করে। গুয়া, নারকেল, পান, ইত্যাদি রপ্তানির কথা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে রয়েছে। বাণিজ্য দ্রব্য যে বাংলা থেকে সিংহলে রপ্তানি হত সেই বিষয়ে অনুমান করা যায়। সমুদ্রপথের বাণিজ্যে বঙ্গদেশ প্রাচীন কালে সমৃদ্ধ ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত রৌপ্যমুদ্রায় সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি আছে এবং একটি মৃৎফলকে দুটি মাস্তুলসহ সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি আছে। বঙ্গের সাথে দক্ষিণ ভারতের ও সিংহলের বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। প্লিনিও বঙ্গ-সিংহল বাণিজ্য পথের কথা উল্লেখ করেছেন। 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথিয়ান সী' গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা নাবিক বঙ্গদেশের সাথে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বাণিজ্য পথের কথা জানাচ্ছেন। নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় বলেছেন- "নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্য-পথের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায়।"[xxvii]। এছাড়া তাম্রলিপ্ত থেকে চট্টগ্রাম- আরাকানের সমুদ্র উপকূল ধরে যাতায়াতের প্রচলন ছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে উড়িষ্যা হয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেবার একটি পথের কথা বলেন টলেমি, "তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি সোজা আসিত ওড়িশা দেশের পলৌরা (paloura) বন্দরে, এবং সেখান হইতে কোনাকুনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপগুলিতে।"[xxviii] তবে ধনপতির বাণিজ্য প্রসঙ্গে রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে আমদানি দ্রব্যের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ আছে, যেমন- "পাটসোনা বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।।"[xxix]

যাত্রার আগে লহনা ও খুল্লনা 'তরণী পূজা' করে। কুলপুরোহিত এসে পূজা করে। শঙ্খ, বীণা, দুন্দুভি বাজিয়ে মধু, দই, শর্করা ইত্যাদি নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

"লহনা বাইন্যানি শতেক আইয় আনি
মঙ্গল দিআ জয়ধ্বনি।
দুন্দুভি শঙ্খ বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে পূজনে তরণী।"[xxx]

কর্ণধারকেও বসন-ভূষণ দান করে সম্মান জানানো হয়েছে। সমুদ্রযাত্রা খুবই বিপদ সঙ্কুল। নৌকাডুবি, ঝড়, জলদস্যু ও আরো অনেক ভয়ের কারণে যাত্রা শুভ হওয়ার কামনায় সমুদ্রযাত্রাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, লৌকিক রীতি-নীতি ও নানান দেব-দেবীর পূজা বহুল প্রচলিত। এছাড়া নৌকাকে দেবতা হিসাবে পূজা করার প্রচলন প্রায় সব নৌ-জীবীদের মধ্যে আছে। নীহার মজুমদার 'এবং বাংলার লৌকিক জলযান' গ্রন্থে নৌকা পূজার এমন প্রথার কথা জানিয়েছেন- "যাত্রার শুভ সকালে পাঁচজন সধবা নারী নৌকাটিকে বরণ ডালা সহকারে পূজা করে। নৌকাটির অগ্র এবং পশ্চাদভাগে তেল লাগানো এবং পবিত্র জল ছিটানো হয়। তারপর দুই বিপরীত কোণে সিন্দুর এবং মালা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অর্পণ করা হয় বা পূজা হয় ধান, দুর্বা, হলুদ, তুলসী, ফুল ইত্যাদি দিয়ে। একই সময় উচ্চারিত হয় উলুধ্বনি। মাটির প্রদীপ জ্বেলে সঙ্গে হাতপাখা নিয়ে আরতি করা হয়।

সবশেষে জলযাত্রার প্রারম্ভে বিদায়কালীন শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানানো হয়।"[xxxi] অঞ্চলভেদে এই পূজা পদ্ধতি, লোকাচার ও আরাধ্য দেবতায় পার্থক্য দেখা যায়। তবে সর্বত্রই সমুদ্রের বিপদ সঙ্কুল পথে বা নদীপথে যাত্রার পূর্বে নৌকা পূজা করার রীতি রয়েছে।

যাত্রার আগে শনিপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা ও গঙ্গাদেবীর পূজা বহুল প্রচলিত। অঞ্চলভেদে নানা স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা করা হয় যেমন- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মাকাল ঠাকুর মৎস্যজীবীদের উপাস্য দেবতা, বনবিবি বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুন্দরবন অঞ্চলে মাঝিদের মধ্যেও বনবিবির পূজা প্রচলিত, দীঘায় নাইকানা বুড়ির পূজা প্রচলিত। মহীশূরের মৎস্যজীবীদের দেবতা কানিয়াম্মা। বাংলায় ও অধুনা পূর্ব বঙ্গের মাঝি-মল্লাদের মধ্যে বদর পীর ও পাঁচ পীরের বন্দনা প্রচলিত-

"আমরা আছি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর বদর বদর।।"[xxxii]

এই পাঁচ জন পীর হলেন— গিয়াসুদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দার শাহ্, বড় খাঁ গাজী এবং কালু। মাঝিরা নৌকা ছাড়ার সময় বদর পীর ও পাঁচ পীরের বন্দনা করে এবং জলপথে বিপদে পড়লে এঁদের স্মরণাপন্ন হয়।

ধনপতি যাত্রার আগে দেবী চণ্ডীর পূজা করতে অস্বীকার করে রওনা হয়। যাত্রা সূচনায় নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দেয়।

"বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা।
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল-কাঁটা।।
যাত্রার সমএ ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিআ কাটভার লৈআ আইসে পথে।।
সুখানা চালেতে বস্যা কলবলায়ে কাউ।
যোগিনী মাগএ ভিক্ষা আদখানি লাউ।।
...
বামে ভুজঙ্গম দেখে দক্ষিণে শৃগালী।।"[xxxiii]

লোক-সংস্কার ও লোক-বিশ্বাসের প্রেক্ষিতটি এখানে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মঙ্গলকাব্যে এই ভাবে বারেবারে তৎকালীন সমাজচিত্র এবং লোকসংস্কারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়।

দেবীকে অপমান করার শাস্তি স্বরূপ ধনপতির নৌকাডুবি হয়। কালীদহে সে কমলে-কামিনী দর্শন করে, এই মূর্তি সিংহলে তার ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে আনে। সিংহল রাজকে কমলে-কামিনী না দেখাতে পারার জন্য রাজা, ধনপতিকে কারাগারে বন্দি করে। ধনপতির সিংহলযাত্রার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় যখন বারো বছর পর আবার শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে পাড়ি দেয় দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে।

পিতৃপরিচয় নিয়ে সমাজ সন্দেহ প্রকাশ করলে, পিতা ধনপতির খোঁজে শ্রীমন্ত সিংহল যাওয়ার জন্য মনস্থির করে। যে দুর্ভাগ্যজনক সিংহলযাত্রায় খুল্লনা ও লহনা স্বামীকে হারিয়েছে সেই সিংহলের দুর্গম পথে একমাত্র সন্তানকে তারা ছেড়ে দিতে চায় না। কিন্তু শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

"বাপের উদ্দিশ-আশে জাইব সিংহল দেশে
সাত নৌকা করিআ সাজন।।"[xxxiv]

ভক্ত শ্রীমন্তর জন্য দেবী চণ্ডী নিজে নৌকা নির্মাণের উদ্যোগ নেন। দেবী বিশ্বকর্মাকে নিযুক্ত করেন নৌকা নির্মাণের জন্য। 'বিশ্বকর্মা কর্তৃক ডিঙ্গা নির্মাণ' অংশে বাংলার নৌকা নির্মাণ শিল্পের একটি আভাস পাওয়া যায়। "মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড় দেশবাসীদের (গৌড়ান্)

"সমুদ্রাশ্রায়ান্" বলা হইয়াছে,"[xxxv]। বাংলায় হুগলীর বালাগড় অঞ্চলে যে নৌ-নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠেছে তা নিজস্ব একটি ঘরানার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। বাংলার দিনাজপুর, শ্রীপুর, সপ্তগ্রাম নৌকা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। চট্টগ্রাম ছিল সমৃদ্ধ বন্দর। চট্টগ্রাম নৌকা নির্মাণে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারত নদীমাতৃক দেশ, তাই প্রকৃতিগত কারণেই এই দেশ জলযান নির্মাণে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। 'শিল্প-সংহিতা' এবং 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে জলযান নির্মাণ বিষয়ে নানা তথ্য আছে। সেখানে কাঠকে চার বর্ণে ভাগ করা হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রাহ্মণজাতীয় কাঠ লঘু, কোমল ও সুঘট। ক্ষত্রিয়জাতীয় কাঠ দৃঢ়াঙ্গ, লঘু ও অঘট। বৈশ্যজাতীয় কাঠ কোমল, গুরু। শূদ্র জাতীয় কাঠ দৃঢ়াঙ্গ ও গুরু। ভোজরাজ ক্ষত্রিয় কাঠকে নৌকার জন্য আদর্শ বলেছেন। এছাড়া এক জাতীয় কাঠের সাথে অন্য কাঠের মিশ্রণ নিষেধ ছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনুসারে শ্রীমন্তের নৌকা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়- কাঁঠাল, পিয়াল,তাল, শাল ইত্যাদি কাঠ। যদিও বর্তমানে নৌকা নির্মাণের জন্য শাল, সেগুন,অর্জুন, বাবলা ইত্যাদি কাঠের ব্যবহার বেশি প্রচলিত। নৌকার জন্য কাঠের 'পাটি' বা পাটা 'গজাল' অর্থাৎ লোহার পেরেক দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়।

"শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি
নানা ফুলে বিচিত্র কলস।
পিতা পুত্রে দোঁহে আঁটি গজালে গাঁথিআ পাটী
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস।।"[xxxvi]

কাব্যের মধ্যে নৌকার আয়তন সম্পর্কে বলা হয়েছে -

"প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ"[xxxvii]

প্রাচীন সময়ে 'উন্নত' শ্রেণির নৌকা ছিল পাঁচটি, এই নৌকাগুলির আয়তন সাধারণত হত - 'ঊর্ধা' নৌকা ২২ হাত লম্বা,১৬ হাত চওড়া ও ১৬ হাত উঁচু, 'অনূর্ধা' ৪৮ হাত লম্বা ২৪ হাত চওড়া এবং ২৪ হাত উঁচু, 'স্বর্ণমুখী' ৬৪ হাত লম্বা ৩২ হাত চওড়া ও ৩২ হাত উঁচু, 'গর্ভিণী' ছিল ৮০ হাত লম্বা ৪০ হাত চওড়া এবং ৪০ হাত উঁচু, 'মন্থরা' নৌকা ৯৬ হাত লম্বা ৪৮ হাত চওড়া এবং ৪৮ হাত উঁচু।

শ্রীমন্তের জন্য যে নৌকাগুলি তৈরি হয় তাদের নাম হল - 'মধুকর', 'গুয়ারেখি', 'রণজয়া', 'রণভীমা', 'সর্ব্বধরা', 'নটশালা' ইত্যাদি। শুধু নৌকা গড়া নয়, তাকে সুন্দর ক'রে সজ্জিতও করা হত। নৌকাকে নানাভাবে সজ্জিত করার কথাও এখানে বলা হয়েছে-

"মকর-আকর মাথা গজেক অন্তরে বাতা
মানিকে করিল চক্ষুদান।।"[xxxviii]

নৌকার সামনের অংশে মকর, সিংহ, হাঙর ইত্যাদির অবয়ব ব্যবহার করা হত। এছাড়া কলস, ভ্রমর, মণি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হত। "মুক্তার লহরের দ্বারা ভূষিতের নাম সর্ব্বতোভদ্রা, স্বর্ণাদি ধাতুর মাল্যে ভূষিতের নাম জয়মালা।"[xxxix]। জনপ্রিয় ছিল নৌকায় মকর, সিংহ, হাঙর ইত্যাদির মুখাবয়ব ব্যবহার। শ্রীমন্তের "মকর-আকর মাথা"[xl] নৌকাটি হল 'মধুকর', এর "মধ্যে যার রইঘর' এবং 'পাছে গড়ে মানিক-ভাণ্ডার'। শ্রীমন্তের 'গুয়ারেখি' নামক নৌকা হল সিংহমুখী- "গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখি / নামে ডিঙ্গা গুয়ারেখি"। নৌকা তৈরির পরে নৌকার 'দণ্ড', 'কেরুয়াল' বানিয়েছে কাঁঠাল ও শাল কাঠ দিয়ে।

"বাছিআ কাঁঠাল শাল গড়ে দণ্ড-কেরুয়াল
ডিঙ্গাশিরে বান্ধিল মুড্যালা।"[xli]

শিরোভূষণ দিয়ে নৌকাকে সুসজ্জিত করার উল্লেখও আমরা পাচ্ছি। শুধু কারিগরি দক্ষতা নয়, তারসাথে বহু যত্ন দিয়ে নৌকা নির্মাণ করা হত। নৌকা নির্মাণের জন্য নানান শুদ্ধাচার, লৌকিক নিয়ম, দেব-দেবীর পূজা ও সাজসজ্জা সবই যত্নের সাথে করা হ'ত। নৌকা নির্মাণ, কাঠ সংগ্রহ করা ইত্যাদির সময় শুদ্ধাচারে স্নান করে তবে কার্যগুলি সম্পন্ন করা হয়, নৌকা যে স্থানে তৌরি হবে সেই স্থানটি পরিষ্কার রাখা হয়, ধূপ জ্বালা হয়, প্রদীপ দেওয়া হয়।

পিতার মতোই শ্রীমন্তের যাত্রার পূর্বে দৈবজ্ঞ আসেন। দৈবজ্ঞ গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে 'শুভযাত্রা বিচার করেন সাধু মনে'[xlii]। দৈবজ্ঞ জানায় শ্রীমন্তের যাত্রা সফল হবে এবং পিতার সাথে দেখা হবে। শ্রীমন্তও বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে এবং রাজার অনুমতি নিয়ে যাত্রা করে। ধনপতির সিংহল যাওয়ার আগে খুল্লনা চণ্ডী পূজা করেছিল। তখন ধনপতি দেবী চণ্ডীকে অপমান ক'রে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। অপরদিকে শ্রীমন্ত ছেলেবেলা থেকে চণ্ডী ভক্ত খুল্লনার দ্বারা পালিত, সে দেবী চণ্ডীকে নমস্কার ক'রে যাত্রা আরম্ভ করে "পুষ্প দিআ চণ্ডীপদে করাইল নমস্কার।"[xliii]। খুল্লনা ও লহনা যাত্রা আরম্ভের সময় গণেশ, সূর্য, শিব, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা করে, এছাড়া নৌকাকে পূজা ক'রে, কর্ণধার ও নাবিককে অলঙ্কার বস্ত্র দিয়ে সম্মান জানায়। শ্রীমন্ত নিজে ভ্রমরার জলে চণ্ডী পূজা করে-

"প্রথমে ভ্রমরার জলে শ্রীমন্ত কোলাহলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডী আই।"[xliv]

মগরায় ঝড়-বৃষ্টিতে শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর স্তব করলে বিপদ কেটে যায়। প্রায় একই ঘটনা দেখা যায় বারো বছর আগে যখন ধনপতি এই একই পথ দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেবী রুষ্ট থাকায় ধনপতির নৌকা ডুবি হয়। পিতার মতোই শ্রীমন্তও কমলে-কামিনী মূর্তি দেখে। রাজা শালিবাহন শ্রীমন্তকে বলে কমলে-কামিনী দেখাতে, কিন্তু দেবীকে দেখাতে পারে না। যখন শ্রীমন্তকে মশানে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায় তখন শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর স্তব করলে দেবীর কৃপায় রক্ষা পায় এবং শালিবাহন কমলে-কামিনী মূর্তি দেখতে পায়। চণ্ডীর কাছে শ্রীমন্ত পিতাকে ফিরে পাওয়ার অনুনয় করে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে ও শরীরে নানা চিহ্ন দেখে ধনপতিকে ফিরে পায়। চণ্ডী হলেন 'হারানো প্রাপ্তির দেবতা'[xlv], সেই দিক থেকে দেখতে গেলে দেবী, বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ধনপতিকে অবশেষে তার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরিয়ে দেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত উজানিতে ফিরে আসে। ধনপতি সিংহলযাত্রা ক'রে নিজেকে এবং সমগ্র পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সেই দুর্ভাগ্য থেকে সকলকে মুক্ত করেছে শ্রীমন্ত। অবশ্য সবটাই হয়েছে দেবী চণ্ডীর কৃপায়।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের যাত্রাপথের এই চিত্রগুলি তৎকালীন সমাজের জীবনধারা ও সংস্কৃতির রূপরেখাকে প্রতিফলিত করে।

---

**তথ্যসূত্র :**


[i] ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রথম যৌথ প্রকাশ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেটলিমিটেড, ২০১৫, পৃ -৩১

[ii] Campbell, Joseph, introduction to the 2004 commemorative Edition, 'What Does The Soul Want?' by Clarissa Pinkola Estes, *The Hero With Thousand Faces*, Commemorative edition,USA, Princeton University press. 2004, p-65

[iii] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-৩

[iv] তদেব, পৃ-৩

[v] Jung, C.G. *volume 9 part 1 of the collective works of C.G.Jung, The Archetypes and the collective unconscious,*Princeton, NJ, Princeton University press, p-3-4.

[vi] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-১২৬

[vii] তদেব,পৃ-১২৭

[viii] তদেব, পৃ-১২৭

[ix] রায়,নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সপ্তম সং, কলকাতা : দে'জ, ১৪১৬, পৃ-৭৪।

[x] তদেব,পৃ-৭৫।

[xi] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-১৪৯

[xii] রায়,নীহাররঞ্জন,বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সপ্তম সং, কলকাতা : দে'জ, ১৪১৬,পৃ-৪৫৫।

[xiii] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-১৫০

[xiv] তদেব, পৃ-১৭৭

[xv] তদেব, পৃ-১৮৮

[xvi] তদেব, পৃ-১৯০

[xvii] তদেব, পৃ-১৯০

[xviii] নস্কর,সনৎকুমার, জলযান-বৃত্তান্ত: প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা। পৃ-৫০২।

[xix] ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র পঞ্চদশ সং, কলকাতা: দে'জ,২০১৪, পৃ-১১৮।

[xx] তদেব, পৃ-১১৮।

[xxi] দত্ত, ভবতোষ, চট্টোপাধ্যায়, বাংলা প্রবাদ, কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৯২, পৃ -২২৩

[xxii] তদেব, পৃ-১৬৮

[xxiii] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-১৯১

[xxiv] তদেব, পৃ-১৯১

[xxv] তদেব, পৃ-১৯১

[xxvi] তদেব, পৃ-১৯১

[xxvii] রায়,নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সপ্তম সং, কলকাতা : দে'জ, ১৪১৬,পৃ-৯৭।

[xxviii]তদেব ,পৃ-৯৮।

[xxix] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-১৯১

[xxx] তদেব, পৃ-১৯২

[xxxi] মজুমদার,নীহার, এবং বাংলার লৌকিক জলযান, প্রথম সং, কলকাতা: আত্মজা, ২০১৭,পৃ-৬৫।

[xxxii] দাস,গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, প্রথম সং, বারাসাত চব্বিশ পরগণা : শেহিদ লাইব্রেরী,১৯৭৬,পৃ-২০৩।

[xxxiii] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-১৯৬

[xxxiv] তদেব,পৃ-২২১

[xxxv] রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সপ্তম সং, কলকাতা : দে'জ, ১৪১৬, পৃ-১৫২।

[xxxvi] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-২২৩

[xxxvii] তদেব, পৃ-২২৩

[xxxviii] তদেব,পৃ-২২৩

[xxxix] মজুমদার, নীহার, এবং বাংলার লৌকিক জলযান, প্রথম সং, কলকাতা: আত্মজা, ২০১৭,পৃ-৪২।

[xl] সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২, পৃ-২২৩

[xli] তদেব, পৃ-২২৪

[xlii] তদেব, পৃ-২২৫

[xliii] তদেব,পৃ-২২৯

[xliv] তদেব,পৃ-২২৯

[xlv] নস্কর,সনৎকুমার, মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণচণ্ডী ধনপতি উপাখ্যান, ১ম সং, কলকাতা : বিদ্যা, ২০১৫,পৃ. ৫৮।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৫৯।
২. চৌধুরী, ভূদেব ,বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলকাতা : দে'জ, ২০১৫।
৩. দাস, ক্ষুদিরাম, বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ, ২০১৫।
৪. দাস, গিরীন্দ্রনাথ,বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, প্রথম সং, বারাসাত চব্বিশ পরগণা :শেহিদ লাইব্রেরী, ১৯৭৬।
৫. দত্ত, অক্ষয়কুমার, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার, কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস ডিপোসিটরি, ১৯০১।
৬. নস্কর, সনৎকুমার, মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণচণ্ডী ধনপতি উপাখ্যান,কলকাতা : জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, ২০১৫।
৭. নস্কর, সনৎকুমার, মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণচণ্ডী কালকেতুপালা, কলকাতা : রত্নাবলী, ২০১৪।
৮.নস্কর, সনৎকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন,২০১২।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০১৩-২০১৪।
১০.বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার,বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড,দ্বিতীয় পর্ব কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি,২০১৩-২০১৪ ।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার,কবিকঙ্কণচণ্ডী, কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
১২.বসু,গোপেন্দ্রেকৃষ্ণ,বাংলার লৌকিক দেবতা, প্রথম পরিবর্ধিত দে'জ সং, কলকাতা:দে'জ, ১৯৭৮ ।
১৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন,বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র,পঞ্চদশ সং, কলকাতা: দে'জ,২০১৪ ।
১৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,কলকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেটলিমিটেড,২০১৫ ।
১৫.মজুমদার,নীহার, এবং বাংলার লৌকিক জলযান, প্রথম সং, কলকাতা: আত্মজা,২০১৭।
১৬. রায়, নীহাররঞ্জন,বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা: দে'জ,২০০০।
১৭.সেন, সুকুমার, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৬২
১৮. সেন, সুকুমার,বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খন্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স,২০১৪ ।

**ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

1. Campbell, Joseph (2004) The Hero With Thousand Faces, Commemorative edition,USA : Princeton University press.
2. Jung, C.G. volume 9 part 1 of the collective works of C.G.Jung, The Archetypes and the collective unconscious,Princeton, NJ : Princeton University press.